

তীন অর্থাৎ, আজীর তথা ডুমুর বৃক্ষ। (দুই) যয়তুন বৃক্ষ। (তিন) সিনাই প্রান্তররস্থ তুর পর্বত। (চার) মক্কা মোকাররমা। এই বিশেষ শপথের কারণ এই হতে পারে যে, তুর পর্বত ও মক্কা নগরীর ন্যায় ডুমুর ও যয়তুন বৃক্ষও বিপুল উপকারী বস্তু। এটাও সম্ভবপর যে, এখানে তীন ও যয়তুন উল্লেখ করে সে স্থানকে বোঝানো হয়েচে, যেখানে এ বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। আর সে স্থান হচ্ছে শাম দেশ, যা অগণিত পয়গম্বরগণের আবাসভূমি। হযরত ইবরাহীম (আঃ) সে দেশে অবস্থান করতেন। তাঁকে সেখান থেকে হিজরত করিয়ে মক্কা মোকাররমায় আনা হয়েছিল। এভাবে উপরোক্ত শপথসমূহে সেসব ভূমি অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে, যেখানে বিশেষ বিশেষ পয়গম্বরগণ জন্মগ্রহণ করেছেন ও প্রেরিত হয়েছেন। শাম দেশ অধিকাংশ পয়গম্বরের আবাসভূমি। তুর পর্বত মুসা (আঃ)-এর আল্লাহর সাথে বাক্যালাপের স্থান। সিনীন অথবা সীনা তুর পর্বতের অবস্থানস্থলের নাম। নিরাপদ শহর শেফনবী (সাঃ)-এর জন্মস্থান ও বাসস্থান।

শপথের পর বলা হয়েছে : **لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ**  
—এর শাব্দিক অর্থ কোন কিছুই অবয়ব ও ভিত্তিকে ঠিক করা।

**أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ**—এর উদ্দেশ্য এই যে, তার মজ্জা ও স্বভাবকেও অন্যান্য সৃষ্ট জীবের তুলনায় উত্তম করা হয়েছে এবং তার দৈহিক অবয়ব এবং আকার-আকৃতিকেও দুনিয়ার সব প্রাণী অপেক্ষা সুন্দরতম করা হয়েছে।

সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে মানুষ সর্বাধিক সুন্দর : মানুষকে আল্লাহ তাআলা সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে সর্বাধিক সুন্দর করেছেন। ইবনে আরাবী বলেন : আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে মানুষ অপেক্ষা সুন্দর কেউ নেই। কেননা, আল্লাহ তাআলা তাকে জ্ঞানী, শক্তিবান, বক্তা, শ্রোতা, দ্রষ্টা, কুশলী এবং প্রজ্ঞাবান করেছেন। এগুলো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলার গুণাবলী। সেমতে বোখারী ও মুসলিমের হাদীসে আছে **ان الله خلق ادم**—অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা আদম (আঃ)—কে নিজের আকারে সৃষ্টি করেছেন। এর অর্থ এটাই হতে পারে যে, আল্লাহ তাআলার কতিপয় গুণাবলী কোন কোন পর্যায়ে তাকেও দেয়া হয়েছে। নতুবা আল্লাহ তাআলার কোন আকার নেই।—(কুরতুবী)

**ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ**—পূর্বের আয়াতে মানুষকে সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে সুন্দরতম সৃষ্টি করার বর্ণনা ছিল। এ আয়াতে তার বিপরীতে বলা হয়েছে যে, সে যৌবনের প্রারম্ভে যেমন সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ ছিল, তেমনি পরিশেষে সে নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতর এবং মন্দ থেকে মন্দতর হয়ে যায়। বলাবাহুল্য, এই উৎকৃষ্টতা ও নিকৃষ্টতা তার বাহ্যিক ও শারীরিক অবস্থার দিক দিয়ে বলা হয়েছে। যৌবন অন্তিমিত হয়ে গেলে তার আকার-আকৃতি বদলে যায়। বার্ষিক্য এসে তাকে সম্পূর্ণ পাল্টে দেয়। সে কুশলী দৃষ্টিগোচর হতে থাকে এবং কর্মক্ষমতা হারিয়ে অপরের উপর বোঝা হয়ে যায়। কারও কোন উপকারে আসে না। অন্যান্য জীব জন্তু এর বিপরীত। সেগুলি শেষ পর্যন্ত কর্মক্ষম থাকে। মানুষ ওসরের কাছ থেকে দুগ্ধ, বোঝা বহন এবং অন্যান্য বহু রকম কাজ নেয়। জবাই করা হলে অথবা মারা গেলেও সেগুলির চামড়া, পশম অস্থি মানুষের কাজে আসে। কিন্তু মানুষ যখন বার্ষিক্যে অক্ষম হয়ে যায়, তখন সে সাংসারিক দিক দিয়ে সম্পূর্ণ বেকার হয়ে যায়। মৃত্যুর পরও তার কোন অংশ দ্বারা কোন মানুষ অথবা জন্তুর উপকার হয় না। সারকথা, মানুষ যে নিকৃষ্টদের মধ্যে নিকৃষ্টতম, এর অর্থ তার বৈষয়িক ও শারীরিক অবস্থা। হযরত যাহ্যাক প্রমুখ থেকে এ তফসীরই বর্ণিত রয়েছে—(কুরতুবী)

এ তফসীর অনুযায়ী পরের আয়াতে মুমিন সংকমশীলগণ এর ব্যতিক্রম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, মুমিন সংকমী বার্ষিক্যে অক্ষম ও অপারগ হয় না। বরং উদ্দেশ্য এই যে, তাদের দৈহিক বেকারত্ব ও বৈষয়িক অকর্মণ্যতার ক্ষতি তাদের হয় না, বরং ক্ষতি কেবল তাদের হয় যারা নিজেদের সমগ্র চিন্তা ও যোগ্যতা বৈষয়িক উন্নতিতেই ব্যয় করেছিল। এখন তা নিঃশেষ হয়ে গেছে এবং পরকালে তাদের কোন অংশ নেই। কিন্তু মুমিন সংকমীর পুরস্কার ও সওয়াব কোন সময়ই নিঃশেষ হয় না। দুনিয়াতে বার্ষিক্যের বেকারত্ব ও অপারগতার সম্মুখীন হলেও পরকালে তার জন্য উচ্চ মর্যাদা ও সুখ বিদ্যমান থাকে। বার্ষিক্যজনিত বেকারত্ব ও কর্ম হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও তাদের আমলানামায় সেসব কর্ম লিখিত হয়, যা তারা শক্তিমান অবস্থায় করত। হযরত আনাসের রেওয়ায়েতে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : কোন মুসলমান অসুস্থ হয়ে পড়লে আল্লাহ তাআলা আমল লেখক ফেরেশতাগণকে আদেশ দেন,

সুস্থ অবস্থায় সে যেসব সংকর্ম করত, সেগুলো তার আমলানামায় লিপিবদ্ধ করতে থাক। (বোখারী) এছাড়া এস্থলে মুমিন সংকমীর প্রতিদান জান্নাত ও তার নেয়ামত বর্ণনা করার পরিবর্তে বলা হয়েছে

**فَلَا يَرْجِعُ فِيهِمْ**—অর্থাৎ, তাদের পুরস্কার কখনও বিচ্ছিন্ন ও কণ্ডিত হবে না। এতে এদিকেও ইঙ্গিত হতে পারে যে, তাদের এই পুরস্কার দুনিয়ার বৈষয়িক জীবন থেকেই শুরু হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা তার প্রিয় বন্দাদের জন্যে বার্ষিক্যে এমন খাতি সহচর জুটিয়ে দেন, যারা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁদের কাছ থেকে আত্মিক উপকারিতা লাভ করতে থাকেন এবং তাদের সর্বপ্রকার সেবায়ত্ব করেন। এভাবে বার্ষিক্যের যে স্তরে মানুষ বৈষয়িক ও দৈহিক দিক দিয়ে অকেজো, বেকার ও অপরের উপর বোঝারূপে গণ্য হয়, সে স্তরেও আল্লাহর প্রিয় বন্দাগণ বেকার থাকেন না। কোন কোন তফসীরবিদ আলোচ্য আয়াতের এরূপ তফসীর করেছেন যে,

**وَرَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ** সাধারণ মানুষের জন্যে নয়; বরং কাকের ও পাপাচারীদের জন্যে বলা হয়েছে, যারা খোদা প্রদত্ত সুন্দর অবয়ব, গুণগত উৎকর্ষ ও বিবেককে বৈষয়িক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পেছনে বরবাদ করে দেয়। এই অকৃতজ্ঞতার শাস্তি হিসেবে তাদেরকে হীনতম পর্যায়ে পৌঁছে দেয়া হবে। এমতাবস্থায় **إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا** বাক্যের ব্যতিক্রম বাহ্যিক অর্থেই বহাল থাকে। অর্থাৎ, যারা মুমিন ও সংকমী, তাদেরকে নিকৃষ্টতম পর্যায়ে পৌঁছানো হবে না। কেননা, তাদের পুরস্কার সব সময়ই অব্যাহত থাকবে।—(মাহহারী)

**فَمَا يَكْفُرُكَ بِكَ بَعْدَ الْيَقِينِ**—এতে কেয়ামতে অবিশ্বাসীদেরকে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, খোদায়ী কুদরতের উপরোক্ত দৃশ্য ও পরিবর্তন দেখার পরও তোমাদের জন্যে পরকাল ও কেয়ামতকে মিথ্যা মনে করার কি অবকাশ থাকতে পারে। আল্লাহ তাআলা কি সব বিচারকের মহাবিচারক নন?

হযরত আবু হোরাযরা (রাঃ)—এর রেওয়ায়েতে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : যে ব্যক্তি সূরা তীনের **إِنَّا أَنشَأْنَاهُ بِالْحَكِيمِ** পর্যন্ত পাঠ করে, তার উচিত **ذلك من الشاهدين** বলা। ফোকাহবিদগণের মতে এই বাক্যটি পাঠ করা মোস্তাহাব।

#### সূরা আলাক

ওহীর সূচনা ও সর্বপ্রথম ওহী : বোখারী, মুসলিম ও অন্যান্য নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণিত রয়েছে এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অধিকাংশ আলেম এ বিষয়ে একমত যে, সূরা আলাক থেকেই ওহীর সূচনা হয় এবং এ সূরার প্রথম পাঁচটি আয়াত **مَا أَمَرَ بِكُمْ** (পর্যন্ত) সর্ব প্রথম অবতীর্ণ হয়েছে। কেউ কেউ সূরা মুদ্দাসিসিরকে প্রথম সূরা এবং কেউ সূরা ফাতেহাকে সর্বপ্রথম সূরা বলে অভিহিত করেছেন। ইমাম বগভী অধিকাংশ আলেমের মতকেই বিশুদ্ধ বলেছেন। সূরা মুদ্দাসিকিরকে প্রথম সূরা বলার কারণ এই যে, সূরা আলাকের পাঁচ আয়াত নাথিল হওয়ার পর দীর্ঘকাল কোরআন অবতরণ বন্ধ থাকে, যাকে ওহীর বিরতিকাল বলা হয়ে থাকে—এই বিরতির কারণে রসুলুল্লাহ (সাঃ) ভীষণ মর্মবেদনা ও মানসিক অশান্তির সম্মুখীন হন। এরপর একদিন হঠাৎ জিবরাঈল (আঃ) সামনে আসেন এবং সূরা মুদ্দাসিসির অবতীর্ণ হয়। এ সময়ও ওহী অবতরণ এবং জিবরাঈলের সাথে সাক্ষাতের দরুন রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর মধ্যে সে পূর্বের

মতই ভাবান্তর দেখা দেয়, যা সূরা আলাক অবতীর্ণ হওয়ার সময় দেখা দিয়েছিল। এভাবে বিরতিকালের পর সর্বপ্রথম সূরা মুদাসসিরের প্রাথমিক আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। ফলে একেও প্রথম সূরা আখ্যা দেয়া যায়। সূরা ফাতেহাকে প্রথম সূরা বলার কারণ এই যে, পূর্ণ সূরা হিসাবে একত্রে সূরা ফাতেহাই সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়। এর আগে কয়েকটি সূরার আংশবিশেষই অবতীর্ণ হয়েছিল।—(মাযহারী)

إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ —এখানে اسم শব্দ যোগ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যখনই কোরআন পড়বেন, আল্লাহর নাম অর্থাৎ, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম দ্বারা শুরু করবেন। এতে রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর পেশকৃত ওয়েরের জওয়াবের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আপনি যদিও বর্তমান অবস্থায় উম্মী; লেখাপড়া জানেন না, কিন্তু আপনার পালনকর্তা উম্মী ব্যক্তিকে উচ্চতর শিক্ষা, বাক-নৈপুণ্য, বিশুদ্ধ ভাষাজ্ঞান ও প্রাজ্ঞতার এমন পরাকাষ্ঠা দান করতে পারেন, যার সামনে বড় বড় পণ্ডিত ব্যক্তিও স্বীয় অক্ষমতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। পরবর্তীকালে তাই প্রকাশ পেয়েছিল।—(মাযহারী) এস্থলে বিশেষভাবে আল্লাহর ‘রব’ নামটি উল্লেখ করায় এ বিষয়বস্তু আরও জোরদার হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলাই আপনার পালনকর্তা। তিনি সর্বতোভাবে আপনাকে পালন করেন। তিনি উম্মী হওয়া সত্ত্বেও আপনাকে পাঠ করাতে সক্ষম। আল্লাহর গুণাবলীর মধ্য থেকে এস্থলে বিশেষভাবে সৃষ্টিগুণ উল্লেখ করার মধ্যে সম্ভবতঃ রহস্য এই যে, সৃষ্টি তথা অস্তিত্ব দান করাই সৃষ্টির প্রতি আল্লাহ তাআলার সর্বপ্রথম অনুগ্রহ। এস্থলে ব্যাপকতার দিকে ইঙ্গিত করার জন্যে خلق ক্রিয়াপদের কর্ম উল্লেখ করা হয়নি। অর্থাৎ, সমগ্র বিশৃঙ্খলিত এই সৃষ্টি কর্মের ফল।

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ —পূর্বের আয়াতে সমগ্র বিশৃঙ্খলিত সৃষ্টির বর্ণনা ছিল। এ আয়াতে সেরা সৃষ্টি মানব সৃষ্টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। চিন্তা করলে দেখা যায়, সমগ্র বিশৃঙ্খলিত সার-নির্যাস হচ্ছে মানুষ। জগতে যা কিছু আছে তার প্রত্যেকটির নবীর মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। তাই মানুষকে ক্ষুদ্র জগৎ বলা হয়। বিশেষভাবে মানুষের উল্লেখ করার এক কারণ এরূপ হতে পারে যে, নবুওয়ত রেসালত ও কোরআন নাযিল করার লক্ষ্য খোদায়ী আদেশ-নিষেধ পালন করানো। এটা বিশেষভাবে মানুষেরই কাজ; عَلَق শব্দের অর্থ জমাট রক্ত। মানুষ সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর অতিক্রান্ত হয়। মৃত্তিকা ও উপাদান চতুষ্টয় দ্বারা এর সূচনা হয়, এরপর বীর্ষ ও এরপর জমাট রক্তের পালা আসে। অতঃপর মাংসপিণ্ড ও অস্থি ইত্যাদি সৃষ্টি করা হয়। এসবের মধ্যে জমাট রক্ত হচ্ছে একটি মধ্যবর্তী অবস্থা। এর উল্লেখ করায় এর পূর্বাপর অবস্থাসমূহের প্রতি ইঙ্গিত হয়ে গেছে।

إِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ —এখানে إقْرَأ আদেশের পুনরুল্লেখ করা হয়েছে। এর কারণ এরূপও হতে পারে যে, স্বয়ং রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর পাঠ করার জন্যে প্রথম إقْرَأ বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয় إقْرَأ তবলীগ, দাওয়াত ও অপারকে পাঠ করানোর জন্যে বলা হয়েছে। اكرم বিশেষণে ইঙ্গিত রয়েছে যে, জগৎ সৃষ্টি ও মানব সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ তাআলার নিজের কোন স্বার্থ ও লাভ নেই; বরং এগুলো সব দানশীলতার পরিপ্রেক্ষিতে করা হয়েছে। ফলে তিনি অযাচিতভাবে সৃষ্টজগৎকে অস্তিত্বের মহান নেয়ামত দান করেছেন।

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ —মানব সৃষ্টির পর মানুষের শিক্ষার প্রসঙ্গটি উল্লেখিত হয়েছে। কারণ, শিক্ষাই মানুষকে অন্যান্য জীবজন্তু থেকে স্বতন্ত্র

এবং সৃষ্টির সেরা রূপে চিহ্নিত করে। শিক্ষার পদ্ধতি সাধারণতঃ দ্বিবিধ। (এক)—মৌখিক শিক্ষা এবং (দুই) কলম ও লেখার মাধ্যমে শিক্ষা। সূরার শুরুতে اقْرَأ শব্দের মধ্যে মৌখিক শিক্ষা রয়েছে। কিন্তু এ আয়াতে শিক্ষাদান সম্পর্কিত বর্ণনায় কলমের সাহায্যে শিক্ষাকেই অগ্রণে বর্ণনা করা হয়েছে।

শিক্ষার সর্ব প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ উপায় কলম ও লিখন : হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)—এর রেওয়ায়েতক্রমে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ আল্লাহ তাআলা যখন আদিকালে সবকিছু সৃষ্টি করেন, তখন আরশে তাঁর কাছে রক্ষিত কিতাবে একথা লিপিবদ্ধ করেন যে, আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর প্রবল থাকবে। হাদীসে আরও বলা হয়েছেঃ আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেন এবং তাকে লেখার নির্দেশ দেন। সেমতে কলম কেয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হবে, সব লিখে ফেলে। এ কিতাব আল্লাহর কাছে আরশে রক্ষিত আছে।—(কুরতুবী)

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَم —পূর্বের আয়াতে ছিল কলমের সাহায্যে শিক্ষা দানের বর্ণনা। এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রকৃত শিক্ষাদাতা আল্লাহ তাআলা। তাঁর শিক্ষার মাধ্যমে অসংখ্য, অগণিত—শুধু কলমের মধ্যেই সীমিত নয়। তাই বলা হয়েছে; আল্লাহ তাআলা মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে পূর্বে জানত না। এতে কলম অথবা অন্য কোন উপায় উল্লেখ না করার মাঝে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ তাআলার এ শিক্ষা মানুষের জন্মলগ্ন থেকে অব্যাহত রয়েছে

كَذَٰلِكَ الْإِنْسَانَ يَلْغِي أَنْزَاهُ أَسْفَلَىٰ —আয়াতে রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শনকারী আবু জাহলকে লক্ষ্য করে বক্তব্য রাখা হলেও ব্যাপক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। এতে সাধারণ মানুষের একটি নৈতিক দুর্বলতা বিধৃত হয়েছে। মানুষ যতদিন অপরের প্রতি মুখাপেক্ষী থাকে, ততদিন সোজা হয়ে চলে। কিন্তু যখন সে মনে করতে থাকে যে, সে কারও মুখাপেক্ষী নয়, তখন তার মধ্যে অবাধ্যতা এবং অপরের উপর জুলুম ও নির্যাতনের প্রবণতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। সাধারণতঃ বিস্তাশালী, শাসনক্ষমতায় আসীন ব্যক্তিবর্গ এবং ধনজন, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের সমর্থনপুষ্ট এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে এই প্রবণতা বহুল পরিমাণে প্রত্যক্ষ করা যায়। তারা ধনাঢ্যতা ও দলবলের শক্তিতে মদমস্ত হয়ে অপরকে পরওয়ানি করে না। আবু জাহলের অবস্থাও ছিল তদ্রূপ। সে ছিল মক্কার বিস্তাশালীদের অন্যতম। তার গোত্র এমনকি সমগ্র শহরের লোক তাকে সহীহ করত। সে এমনি অহংকারে মত্ত হয়ে পয়গম্বরকুল শিরোমণি ও সৃষ্টির সেরা মানব রসুলে করীম (সাঃ)—এর শানে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে বসল। পরের আয়াতে এমনি ধরনের অবাধ্য লোকদের অশুভ পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে। إِنَّ لِلَّهِ رَبِّكَ الْخَبْرَىٰ অর্থাৎ, সবাইকে তাদের পালনকর্তার কাছে ফিরে যেতে হবে। এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, মৃত্যুর পর সবাই আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে এবং ভাল-মন্দ কর্মের হিসাব নেবে। অবাধ্যতার কুপরিণাম স্বচক্ষে দেখে নেবে।

أَوَلَيْسَ الَّذِي يَنْهَى عِبْدَ إِدْرِيسَ —এখান থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত একটি ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। নামাযের আদেশ লাভ করার পর যখন রসুলুল্লাহ (সাঃ) নামায পড়া শুরু করেন, তখন আবু জাহল তাঁকে নামায পড়তে বারণ করে এবং ছমকি দেয় যে, ভবিষ্যতে নামায পড়লে ও

القدر: ৯৫ - البينة: ৯৮

১০৫

১০৬

سَدَّ الزَّيْبَانِيَةَ ۖ كَلَّا لَا تَطْعُهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۝
سُبْحَانَ الْقَدْرِ وَبِحَمْدِهِ ۝
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۖ وَمَا ذَرِكُ مَالِيْلَةُ الْقَدْرِ ۖ لَيْلُهُ
الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ سَهْرٍ ۖ نَزَّلْنَا الْمَلَائِكَةَ وَالرُّوحَ فِيهَا
يَأْذِنُ رَبُّهُمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ۖ سَلَامٌ شَهِ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝
سُبْحَانَ الْقَدْرِ وَبِحَمْدِهِ ۝
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ
حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۖ رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۖ
فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ ۖ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ
بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۖ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۖ لَهُ حُفَاءٌ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ
وَذَلِكَ دِينُ الْقِيمَةِ ۖ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ
الْمُشْرِكِينَ فِي تَارِيحِهِمْ خُلِدُوا فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۖ

(১৮) আমিও আহ্বান করব জাহান্নামের প্রহরীদেরকে (১৯) কখনই নয়, আপনি তার আনুগত্য করবেন না। আপনি সেজদা করুন ও আমার নৈকট্য অর্জনকরুন।

## সূরা কদর

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত ৫

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু—

(১) আমি একে নাখিল করেছি শবে-কদরে। (২) শবে-কদর সমুদ্রে আপনি কি জানেন? (৩) শবে-কদর হল এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। (৪) এতে প্রত্যেক কাজের জন্যে ফেরেশতাগণ ও রূহ অবতীর্ণ হয় তাদের পালনকর্তার নির্দেশক্রমে। (৫) এটা নিরাপত্তা যা ফজরের উদয় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

## সূরা বাইয়্যিনাহ্

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত ৮

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু—

(১) আহ্লে-কিতাব ও মুশরেকদের মধ্যে যারা কাকের ছিল, তারা প্রত্যাবর্তন করত না যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসত। (২) অর্থাৎ, আল্লাহর একজন রসূল, যিনি আবৃত্তি করতেন পবিত্র সহীফা, (৩) যাতে আছে, সঠিক বিষয়বস্তু। (৪) অপর কিতাব প্রাপ্তরা যে বিজ্ঞ হইয়াছে তা হইয়াছে, তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পরেই। (৫) তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা ঋণী মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর এবাদত করবে, নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে। এটাই সঠিক ধর্ম। (৬) আহ্লে-কিতাব ও মুশরেকদের মধ্যে যারা কাকের, তারা জাহান্নামের আগুনে স্থায়ীভাবে থাকবে। তারাই সৃষ্টির অধম।

সেজদা করলে সে তাঁর ঘাড় পদতলে পিটি করে দেবে। এর জওয়াবে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে। বলা হয়েছে : **لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَرَى** অর্থাৎ, সে কি জানে না যে, আল্লাহ দেখছেন? কি দেখছেন, এখানে তার উল্লেখ নেই। অতএব ব্যাপক অর্থে তিনি নামায প্রতিষ্ঠাকারী মহাপুরুষকেও দেখছেন এবং বাধাদানকারী হতভাগাকেও দেখছেন। দেখার পর কি হবে, তা উল্লেখ না করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সেই ভয়াবহ পরিণতি কম্পনাও করা যায় না।

**نَاصِيَةٍ** এর অর্থ কঠোরভাবে হেঁচড়ানো। **لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ**

শব্দের অর্থ কপালের উপরিভাগের কেশগুচ্ছ। যার এই কেশগুচ্ছ অন্যের মুঠোর ভেতরে চলে যায়, সে তার করতলগত হয়ে পড়ে।

## আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এতে নবী করীম (সাঃ)-কে আদেশ করা হয়েছে যে, আবু জাহলের কথায় কর্ণপাত করবেন না এবং সেজদা ও নামাযে মশগুল থাকুন। কারণ, এটাই আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জনের উপায়।

সেজদায় দোয়া কবুল হয় : আবু দাউদে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) -এর রেওয়ায়েতক্রমে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : বন্দা যখন সেজদায় থাকে, তখন তার পালনকর্তার অধিক নিকটবর্তী হয়। তাই তোমরা সেজদায় বেশী পরিমাণে দোয়া কর। অন্য এক হাদীসে আরও বলা হয়েছে—সেজদার অবস্থায় কৃত দোয়া কবুল হওয়ার যোগ্য।

নফল নামাযের সেজদায় দোয়া করার প্রমাণ রয়েছে। কোন কোন রেওয়ায়েতে এর বিশেষ দোয়াও বর্ণিত আছে। বর্ণিত সে দোয়া পাঠ করাই উত্তম। ফরয নামাযসমূহে এ ধরনের দোয়া পাঠ করার প্রমাণ নেই। কারণ, ফরয নামায সংক্ষিপ্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

আলোচ্য আয়াত যে পাঠ করে এবং যে শুনে, সবার উপর সেজদা করা ওয়াজিব। সহীহ মুসলিমে আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে আছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই আয়াত তেলাওয়াত করে সেজদা করেছেন।

## সূরা কদর

শানে নুযূল : ইবনে আবী হাতেম (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার বনী-ইসরাঈলের জনৈক মুজাহিদ সম্পর্কে আলোচনা করলেন। সে এক হাজার মাস পর্যন্ত অবিরাম জেহাদে মশগুল থাকে এবং কখনও অস্ত্র সংবরণ করেনি। মুসলমানগণ একথা শুনে বিস্মিত হলে এ সূরা কদর অবতীর্ণ হয়। এতে এ উদ্দেশ্যের জন্যে শুধু এক রাত্রির ইবাদতই সে মুজাহিদের এক হাজার মাসের এবাদত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করা হয়েছে। ইবনে জরীর (রহঃ) অপর একটি ঘটনা এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, বনী-ইসরাঈলের জনৈক এবাদতকারী ব্যক্তি সমস্ত রাক্তি এবাদতের মশগুল থাকত ও সকাল হতেই জেহাদের জন্যে বের হয়ে যেত এবং সারাদিন জেহাদে লিপ্ত থাকত। সে এক হাজার মাস